Indian Journal of Multidisciplinary Research and Studies
ISSN: 3108-1681 | Volume- 1, Issue- 4 | October - December 2025

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি নারীদের অবদান

Tanuja khatun
M. A. in History, The University of, Burdwan, West Bengal, India
Email: tanujakhatun30@gmail.com

Abstract:

ভারতবর্ষ একটি স্বাধীন দেশ । এ কথা যেমন সত্য তেমনি স্বাধীন দেশের মধ্যে ঘটে চলেছে নানান ঘাত-প্রতিঘাতের সংগ্রাম। স্বাধীন ভারত এই কথাটি শুনতে এখন আর তেমন উত্তেজনাময় লাগেনা। কিন্তু যখন ভারতবর্ষ পরাধীন ছিল, যখন ভারতবর্ষ অত্যাচারী ব্রিটিশরা শাসন করতো তখন শুধু ভারতের জনগণ মনে প্রাণে চেষ্টা করত ভারতবর্ষে কবে স্বাধীনতা আনব। এই বিদেশীদের ভারত থেকে বিতাড়িত করার জন্য এবং প্রতিটি জনগণের জন্য স্বাধীন ভারত আনবার জন্য মর্মে মর্মে জেগেছিল আত্মাহুতি দেবার নিরব সাধনার দৃঢ় সংকল্প। এমন পরিস্থিতিতে নবজাগ্রত হয়েছিল বাঙালি বীর নারীদের একটা গৌরবময় অংশ। শত বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে নারী প্রগতি যতই বিস্তৃত লাভ করে ততই নারী সমাজ সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। তাদেরই মধ্য থেকে এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে- প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, মাতঙ্গিনী হাজরা ও দুকরিবালা দেবী এর মত প্রমূখ বাঙালি নারী। বিদেশিদের শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য সমাজের মধ্যে এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটালেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিতর দিয়ে নারীরা কেমন করে নিজেদের বিকশিত করে তুলেছিলেন সে বিষয়ে আমরা সকলেই অবগত। এই সমস্ত বীরাঙ্গনা নারীদের কার্যাবলীতে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হয়ে বাঙালি বহু নারী নিজেদেরকে শুধুমাত্র ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেনি। তারা নিজেদের অধিকার, শিক্ষা ও সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা ও টিকে থাকার জন্য নিজেরাই লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছিলেন। তাদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সেকালের উচ্চ-নিচ ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে ও বাড়ির গৃহবধুরাও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে ধীরে ধীরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যা বর্তমান প্রজন্মে একটি নতুন যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছিল। বাংলা শুধুমাত্র একটি অঞ্চলের নাম নয়, বরং একটি চেতনার মানচিত্র_যেখানে সংস্কার, সাহস, নেতৃত্ব ও সাহিত্য মিলিয়ে গড়ে তুলেছিল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের মেরুদন্ড।

Keywords: স্বাধীনতা, জাতীয়তাবোধ, সশস্ত্র সংগ্রাম, বাঙালি নারী, বিপ্লবী কর্মকাণ্ড, দেশাত্মবোধ।

ভূমিকা:

ইংরেজ শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা ছিল অনেকটা প্রদীপের শিখার মত। একদিকে তারা নিজেদের ভবিষ্যতের নিরাপত্তাকে দূরে সরিয়ে বিপ্লবে এগিয়ে দিয়েছিলেন বাংলার অসংখ্য নারীকে। তারা কখনো ঘরের ভিতর থেকে কখনো আবার বাইরে বেরিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে লড়াই করেছেন। বাংলার নারীরা শুধু পুরুষবিপ্লবীদের অনুকরণকারী ছিলেন না, বরং তারা নিজেরাই সংগঠক, যোদ্ধা, নেত্রী এবং অনুপ্রেরণাদাত্রী হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার লক্ষ লক্ষ সাধারণ নারী মদের দোকানে পিকেটিং, বিদেশি পণ্য বয়কট এবং চৌকিদারী কর প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে

আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। অন্যদিকে বাংলার নারীদের আর এক রূপ ধরা পড়েছে কখনো বিপ্লবী, অহিংস সত্যাগ্রহী কখনো আবার সংগঠক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারা রাতের অন্ধকারে পুরুষের ছদ্মবেশে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন আগ্নেয় অস্ত্র ও গোলা বারুদ। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য বিপ্লবীদের যাতে কোনরকম অসুবিধায় না পড়তে হয় তার জন্য তারা সব সময় প্রস্তুত ছিল। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ গোপন আস্তানার মধ্যে লুকিয়ে রাখতেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের এই কাজে প্রায়শই সহযোগিতা করতো অসীম সাহসিকতার বিরঙ্গনা নারী সংগঠনগুলি। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বীণা দাস, কল্পনা দত্ত প্রমূখ সশস্ত্র সংগ্রাম, সভা সমিতি ও রাজনৈতিক কাজে অংশ নিয়ে দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। যা প্রমাণ করে যে, নারীরা শুধু গৃহে সীমাবদ্ধ ছিলেন না বরং সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজেদেরকে যোদ্ধা রূপে সামিল করেছিলেন। তাই গীতিকার মোহিনী চৌধুরী দীপ্ত কণ্ঠে দেশ মাতৃকার জন্য যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে দেশাত্মবোধক গান গাইলেন…

"মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হলো বলিদান

লেখা আছে অশ্রুজলে…"

পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন ভারতবর্ষ গড়ে তোলার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে শামিল হয়েছিলেন বাঙালি নারীদের একটি বৃহৎ অংশ। তারা আন্দোলন থেকে শুরু করে অহিংস সত্যাগ্রহ-সর্বত্রই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এইরকম এক কর্মকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন বাঙালি বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নারী শহীদ। তার জন্ম হয় ১৯১১ সালে চট্টগ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। খুব অল্প বয়স থেকেই তার মনের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়েছিল। তিনি লেখাপড়াতেও একজন কৃতি ছাত্রী ছিলেন। প্রীতিলতা চট্টগ্রামের খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় থেকে ১৯২৭ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। তারপরে তিনি ১৯২৯ সালে ঢাকা ইডেন মহিলা কলেজে ভর্তি হন এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ইডেন কলেজে ছাত্রী থাকাকালীন প্রীতিলতা লীলা নাগের নেতৃত্বে দিপালী সংঘের অন্তর্ভুক্ত শ্রীসংঘের সদস্যা এবং কলকাতার বেথুন কলেজের ছাত্রী থাকাকালে কল্যাণী দাসের নেতৃত্বে ছাত্রী সংঘের সদস্য হন। গ্রাজুয়েশন করার পর তিনি চট্টগ্রামে নন্দনকানন অপর্ণাচরণ নামক একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে যোগদান করেন। তার মতো একজন মেধাবী ছাত্রীর সামনে ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তিনি চাইলেই নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে নিয়ে চলতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি শুধু নিজের কথা ভাবেননি, ভেবেছেন দেশের জনগণের কথা।। কিভাবে তাদেরকে বিদেশি বন্ধন থেকে মুক্ত করবেন তারই প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। তাই তিনি খুব অল্প বয়স থেকেই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। 1930 সালে সমগ্র বাংলা জুড়ে অনেক বিপ্লবী দল সংগ্রামরত অবস্থায় ছিল। এইসব দলের সদস্যরা বিশ্বাস করত যে, কেবলমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হতে পারে। এক্ষেত্রে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের গোপন দলিলপত্র পাঠ থেকে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ হন। প্রীতিলতা সূর্যসেনের নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী দলের প্রথম মহিলা সদস্য হন। তিনি টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিস ধ্বংস এবং রিজার্ভ পুলিশ লাইন দখল অভিযানে যুক্ত ছিলেন। এমনকি তিনি জালালাবাদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে কলকাতায় অবস্থিত আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত রাজবন্দী রামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রীতিলতা সাক্ষাতের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি সফল ভাবে তার কাজ করতে পেরেছিলেন। ১৯৩২ সালের ১৩ ই জুন ধলঘাট সংঘর্ষে কয়েকজন বিপ্লবী প্রাণ হারান। এই বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে শামিল হয়েছিলেন মাস্টারদা

সূর্যসেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। অনেক বিপ্লবী ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন কিন্তু প্রীতিলতা ও মাস্টারদা পালাতে সক্ষম হন। পুলিশের গ্রেপ্তারির তালিকায় প্রীতিলতার নাম অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই কর্মকাণ্ডের মূল গুরু ছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেন। প্রীতিলতার নাম যেহেতু গ্রেফতারি তালিকায় উঠে যায় সেহেতু মাস্টারদা প্রীতিলতাকে তার স্কুল ছেড়ে দিয়ে পুরুষ বিপ্লবীদের মত আত্মগোপন করার নির্দেশ দেন। ১৯৩২ সালে ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রীতিলতার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয় "পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব" আক্রমণের। এই ক্লাবটি ছিল ব্রিটিশদের অস্ত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জাম রাখার একটি গোপন কুঠি। এই ক্লাবটিতে কোন ভারতীয়দের প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। ক্লাবের সামনে লেখা থাকতো "কুকুর ও ভারতীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ" এই রূপ আক্রমণাক মূলক কথার জন্য বিপ্লবীদের কাছে এই ক্লাবটিকে ধ্বংস করার তাৎক্ষণিক কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই ক্লাবটির উপর আক্রমণ চালায় প্রীতিলতা ও তার সহযোগী বিপ্লবীগণ। ক্লাবটিকে ধ্বংস করার পর পুরুষ বেশি ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রীতিলতা সামরিক কায়দায় তার বাহিনীকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি নিজে পালাতে অক্ষম হয়। ইংরেজ পুলিশের দ্বারা তিনি গুলিবিদ্ধ হন এবং ধরা পড়ে যেতে পারেন এই আশঙ্কায় পটাশিয়াম সাইনয়েড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তার এই আত্মদান বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রামকে আরো উজ্জীবিত করে তোলে। তার এই সাহসিকতায় মুগ্ধ হয়ে বাংলার অসংখ্য নারী বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার অসংখ্য নারী পুরুষ এক জোটে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারই মধ্য থেকে বাংলার অগ্নিকন্যা হিসেবে পরিচিত কল্পনা দত্তের আগমন ঘটেছিল। তার জন্ম হয়েছিল ১৯১৩ সালের ২৭ এ জুলাই চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলায়। তিনি শহীদ ক্ষুদিরাম এবং বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেকে বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করেন। বেথুন কলেজে পড়ার পাশাপাশি সেখানে গড়ে ওঠা ছাত্রী সংঘে যোগদান করেন। পূর্ণেন্দু দস্তিদার এর মাধ্যমে তিনি মাস্টারদা সূর্য সেন এর সাথে পরিচিত হন। এবং মাস্টারদা পরিচালিত "ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি", চট্টগ্রামের শাখায় যোগদান করেন। বেথুন কলেজে পড়ার সময় থেকেই তিনি বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন এবং কল্যাণী দাসের ছাত্রী সঙ্গে যোগ দিয়ে নারী বিপ্লবীদের সংগঠিত করার কাজে হাত দেন। অপরদিকে মাস্টারদা সূর্যসেন পরিচালিত বিপ্লবী কর্মকাণ্ডেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বোমা তৈরি, গুপ্ত বার্তা সরবরাহে সাহায্য করেন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নারী শক্তির এক অদম্য প্রতীক হয়ে ওঠেন। ১৯৩০ সালে ১৮ই এপ্রিল "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন" ঘটনার পর কল্পনা দত্ত চট্টগ্রামে ফিরে এসে সূর্য সেন এর সঙ্গে দেখা করেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবী অনন্ত সিংহ, গনেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল প্রমূখ বহুনেতা গ্রেপ্তার হয়ে বিচারাধীন ছিলেন। ইংরেজদের উপর হামলা করার আর এক গোপন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল কলকাতার এক গোপন আস্তানায়। সেখান থেকে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিস্ফোরক দ্রব্যসমূহ নিয়ে আসার দায়িত্ব দেওয়া হয় কল্পনা দত্তকে। তিনি গোপনে উচ্চবিস্ফোরক ও গান কটন প্রস্তুত করেন এবং বিশেষ ট্রাইবুনালে বিচারাধীন বিপ্লবীদের মুক্ত করার জন্য চট্টগ্রাম আদালত ভবনে এবং কারাগারে ডিনামাইট ফিউজ পেতে তা উড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। কল্পনা দত্তের এই পরিকল্পনা কোন কারনে ব্রিটিশ পুলিশের কাছে চলে যায় এবং তিনি ব্রিটিশ পুলিশের কাছে সন্দেহজনক ব্যক্তিতে পরিণত হয়। তার গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখতে শুরু করে। ইতিমধ্যে ১৯৩১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সূর্যসেন কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতাকে চট্টগ্রামের ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ করার দায়িত্ব দেন। আক্রমণের মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে পুরুষের ছদ্মবেশে কল্পনা দত্ত আক্রমণ স্থল জরিপ করতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং গ্রেপ্তার হন। জেলে থাকাকালীন তিনি ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের ঘটনা ও প্রীতিলতার বিরোচিত আত্মত্যাগের কথা জানতে পারেন। কিছুদিন জেলে অতিবাহিত করার পর কল্পনা দত্ত জামিনে মুক্তি পান এবং সূর্যসেনের নির্দেশে আত্মগোপন করেন। ১৯৩৩ সালে ১৬ ই

ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে পুলিশ তাদের গোপন আস্তানা চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেন এবং সূর্যসেন গ্রেপ্তার হন। কল্পনা দত্ত ও অপর নেতা মহেন্দ্র দত্ত সেখান থেকে পালিয়ে যান। ১৯৩৩ সালে উনিশে মে কল্পনা দত্ত ও তাদের দলের কয়েকজন সহকর্মীসহ ব্রিটিশ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার" লুণ্ঠন মামলায় সূর্যসেন ও তারকেশ্বর দস্তিদার কে ফাঁসি এবং কল্পনা দত্তকে যাবজ্জীবন কারাবাসের রাই ঘোষনা করা হয়। দীর্ঘ সময় পর কল্পনা দত্ত কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর তিনি পুনরায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হন । চট্টগ্রামে ফিরে তিনি কৃষক দল ও নারী ফ্রন্ট গঠন করেন। ১৯৪৬ সালে চট্টগ্রাম থেকে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৯৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি কল্পনা দত্ত দিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কল্পনা দত্তের এই আত্মত্যাগ ছিল দেশের প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসা ও অদম্য সাহসের এক জলন্ত উদাহরণ। যা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল।

ভারতবর্ষকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়ার ব্রত নিয়ে যারা এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে এক নির্ভীক হৃদয়ের বাঙালি মহিলা বিপ্লবী হলেন বীণা দাস। বীণা দাশের জন্ম হয় ১৯১১ সালের ২৪ আগস্ট ব্রিটিশ শাসিত ভারতে বাংলার কৃষ্ণনগরে। তার বাবা বেণীমাধব দাস পেশায় একজন শিক্ষক হলেও একইসঙ্গে তিনি সমাজের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। বীণা দাসের মায়ের নাম ছিল সরলা দেবী। তার বড় দিদি কল্যাণী দাস নিজেও একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। ফলে পারিবারিকভাবেই স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রতি তার একটা সহজাত আগ্রহ গড়ে ওঠে। ছোটবেলা থেকেই বীণা দাস ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্রী উচ্চতর শিক্ষার জন্য তিনি কলকাতার বেথুন কলেজে ভর্তি হন । কলেজে গিয়ে বিরাট গ্রন্থাগার দেখে তার জ্ঞানের তৃষ্ণা যেন আরো বিকশিত হলো। নির্বাসিতের আত্মকথা, কারা কাহিনী, বাংলার বিপ্লববাদ ইত্যাদি বই তিনি সেখানে পড়ার সুযোগ পান। মাস্টারদা সূর্যসেনের দীক্ষায় দীক্ষিত অগ্নিকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন বীনা দাস। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন যখন ভারতে আসে সেই সময় সাইমন কমিশন বয়কট ও বেথুন কলেজে পিকেটিং করতে সকলকে উৎসাহিত করতে এগিয়ে আসেন বীণা দাস। পিকেটিং করার জন্য কলেজের আবাসিক ছাত্রীদের ক্ষমা চাইতে বলেন অধ্যক্ষ। কিন্তু কেউই ক্ষমা চাইতে রাজি হয়নি। ফলে অধ্যক্ষ নিজেই পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে যান। এই জয়ে আলবার্ট হলে এক বিরাট সভা আয়োজিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সরলা দেবী চৌধুরানী। তার বক্তব্যে উৎসাহিত হয়ে অনেক নারী নিজেদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য লড়াইয়ের ময়দানে এগিয়ে আসেন। তারপর থেকেই নিখিল বঙ্গ ছাত্র প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি গড়ে ওঠে ছাত্রীর সংঘ যেখানে বীণা দাসের দিদি কল্যাণী দাস যুক্ত ছিলেন। বেথুন কলেজে ছাত্রী থাকাকালীন বীণা দাস তার সহপাঠী শান্তি দাশগুপ্ত এবং সুহাসিনী দত্তের অনুরোধে ও উৎসাহে একটি গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিতে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন। অপরদিকে বাংলায় চলতে থাকে মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগাল লুণ্ঠন। এমন পরিস্থিতিতে বাংলার বুকে গড়ে ওঠা বিপ্লব এক অন্য রূপ ধারণ করেছিল। যার ফলস্বরূপ ব্রিটিশ বাহিনীকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। তখন কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারে চার্লস টেগার্টকে গুলি করে হত্যার প্রচেষ্টায় গ্রেফতার হন দীনেশ মজুমদার ও অনুজা সেন । তারপরেই শান্তি ঘোষ ও সুনিতা চৌধুরী কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে হত্যা করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিতা হন। এমন পরিস্থিতিতে বীণা দাসের গুপ্ত বিপ্লবী দল ভেঙে যায়। তিনি যুগান্তর দলের কর্মী কমলা দাশগুপ্তের কাছে গিয়ে বলেন যে, তাকে একটা রিভলবার এর ব্যবস্থা করে দিতে তিনি কলকাতার তৎকালীন গভর্নরকে গুলি করবেন। এমন একটি কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়লে ফাঁসি কিংবা যাবজ্জীবন হতে পারে তা জেনেও নির্ভীক হৃদয়ে বিনা নিজের হাতে রিভলবার তুলে নেন। অতঃপর ১৯৩২ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

সেনেট হলে সমাবর্তান অনুষ্ঠান শুরু হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার তৎকালীন গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসন। যখন জ্যাকসন সাহেব বক্তব্য রাখার জন্য উঠে দাঁড়ান ঠিক তখনই কয়েক হাত দূর থেকে পরপর পাঁচটি গুলি ছোড়েন বীণা দাস। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার কারণে গভর্নর বেঁচে যান এবং বীণা দাস কে পুলিশ গ্রেফতার করেন। আদালতের বিচারে বীণা দাসের ৯ বছর কারাদণ্ড হয়। ১৯৩৯ সালে তিনি জেল থেকে মুক্ত হয়ে সরাসরি জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত কলকাতা কংগ্রেসের সম্পাদিকা ছিলেন তিনি। হাজরা পার্কে কংগ্রেসের সংগঠনের হয়ে সভা ডাকলে পুলিশ বেআইনি সভা ডাকার অপরাধে বীণা দাস কে গ্রেফতার করে পুনরায়। কারাবাস কাটিয়ে আবার তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে ভারতছাড়ো আন্দোলনের যোগ দেন। সেখানেও তাকে বন্দী করা হয় এবং কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। এইভাবে তার জীবনের চলার পথটাকে দেশের স্বাধীনতার জন্য অর্পণ করেছিল। বীণা দাস তার "শৃংখল ঝংকার" নামক আত্মজীবনীতে বিপ্লবী জীবনের আদর্শ ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরেছেন। তিনি শুধুই একজন বিপ্লবী ছিলেন না বরং ভয়হীনতার প্রতীক হিসাবে বাংলার তরুণীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

স্বনামধন্যা ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী, যিনি তার অকুতোভয় সাহস ও অসামান্য দেশপ্রেমের বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি হলেন মাতঙ্গিনী হাজরা, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক আলোকিত নাম। তিনি ১৮৭০ সালের ১৭ই নভেম্বর মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার অন্তর্গত হোগলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অনেক অল্প বয়সে তার বিবাহ হয়। মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহান এই নেত্রীর অবদান অনস্বীকার্য। ১৯০৫ সালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি যোগ দেন। মতাদর্শের দিক থেকে তিনি গান্ধীবাদী নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯৩২ সালে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় তিনি লবণ আইন অমান্য করার অপরাধে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে কারাবন্দি হন। অল্প কিছুদিন পরেই অবশ্য তিনি কারাগার থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল নারীদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ। মাতঙ্গিনী হাজরা, গ্রামের মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ করে চৌকিদারী কর মুকুবের দাবিতে প্রতিবাদ চালিয়ে গেলে আবার তাকে কারারুদ্ধ হতে হয়। এই সময় তিনি বহরমপুর কারাগারে ছয় মাস বন্দি ছিলেন। তিনি হিজলি বন্দী নিবাসে কারারুদ্ধ ছিলেন। তবুও তিনি মানসিকভাবে এতোটুকুও ভেঙে পড়েনি। তার মনে প্রাণে ছিল অসীম সাহসিকতা ও লড়াকু মনোভাব কোন কিছুতেই তিনি হার মানেননি। দেশের প্রতি ছিল অগাধ ভালোবাসা। তিনি নিজের হাতে চরকা কেটে খাদি কাপড় বানাতেও শুরু করেন। গ্রামবাংলায় প্রচার করতে শুরু করেন সমস্ত রকম বিদেশি পণ্যের যাতে বয়কট করা হয়। একদল মহিলাদের নিয়ে তিনি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে গ্রামে গ্রামে সামাজিক কাজকর্ম, মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিজেরাই প্রস্তুত করে তাদের কাছে পৌঁছে দিতেন। বৃটিশদের বোঝাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন যে ভারতে তাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। ভারতবর্ষ আমার দেশ, ভারতবর্ষ আমার জনগণের দেশ,তোমরা বিদেশী অর্থাৎ ভারতবর্ষ তোমাদের দেশ নয়। ভারত থেকে ইংরেজদের বিতারিত করার জন্য তিনি সক্রিয়ভাবে ভারতছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করলেন। কংগ্রেসের সদস্যরা এই সময় মেদিনীপুর জেলার সকল থানা ও অন্যান্য সরকারি কার্যালয় দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল জেলা থেকে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করে এখানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। প্রধানত মহিলা স্বেচ্ছাসেবক সহ ৬০০০ সমর্থক তমলুক থানা দখলের উদ্দেশ্যে একটি মিছিল বের করেন। এই মিছিলে সামনের সারিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা। তখন তার বয়স ছিল ৭৩ বছর। শহরের উপকণ্ঠে মিছিল পৌঁছালে ব্রিটিশ রাজের পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি ১৪৪ ধারা জারি করে সমাবেশ ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

কিন্তু সেই আদেশ অমান্য করে মাতঙ্গিনী হাজরা অগ্রসর হলে তাকে লক্ষ্য করে ব্রিটিশ পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। শরীরে গুলিবিদ্ধ হওয়ার সত্বেও তিনি থেমে থাকেননি তার লক্ষ্য পুরাণের উদ্দেশ্যে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করেন। ব্রিটিশ পুলিশ তখন বারংবার তার উপর গুলি ছোড়ে। তবুও তিনি চিৎকার কণ্ঠে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে চলেছেন এবং তার হাতের মুঠিতে শক্ত করে উঁচিয়ে ধরা আছে ভারতের জাতীয় পতাকা। এইভাবে তিনি কিছুটা এগিয়ে চলার পর সারা শরীর যখন রক্তাক্ত হয়ে এসেছে তখন তিনি বান্দে মাতারাম ধ্বনি দিয়ে জাতীয় পতাকা উপরে তুলে মৃত্যুবরণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মিছিলের মধ্যেই তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। দেশকে ভালবেসে তার এই বলিদান সকল ভারতীয়দের মনে আলোড়ন জাগিয়েছিল। অত্যাচারী ব্রিটিশ সরকার বুঝতে সচেষ্ট হয়েছিল যে ভারতবর্ষকে আর নিজেদের অধীনে রাখা যাবে না। চারিদিক থেকে ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ শুরু হতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ১৫ ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা অর্জন করলে অসংখ্য স্কুল , পাড়া ও রাস্তার নাম মাতঙ্গিনী হাজরার নামে উৎসর্গ করা হয়। কলকাতার দীর্ঘ বিস্তৃত হাজরা রোড তার নামে নামাঙ্কৃত হয়েছে। স্বাধীন ভারতের কলকাতায় প্রথম যে নারী মূর্তিটি স্থাপন করা হয়েছিল সেটি ছিল মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তি। তিনি ভারতীয় নারীর অসীম সাহস ও ত্যাগের এক চিরন্তন প্রতীক হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের এক অনন্য নাম দুকরিবালা দেবী। যিনি বিপ্লবী দলে মাসিমা নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৭৭ সালের ২১ শে জুলাই বীরভূম জেলার নলহাটি ঝাউপাড়া গ্রামে তার জন্ম হয়। বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধটি বীরত্বের সাথে লড়াই করে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছেন দুকরিবালা দেবী। বীরত্তের সাথে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করা শক্তিশালী মহিলা সহ অনেকের সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগ দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল। এই মহিলাদের মধ্যে অগ্রগামী ব্যক্তিত্ব হিসেবে দাঁড়িয়ে আছেন দুকরিবালা দেবী। তার পরিবারের সকল সদস্যই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে অতপ্রতভাবে জড়িত ছিল। তিনি গ্রামের একজন সাধারন গৃহবধূ থেকে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের রূপান্তরিত হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধে তার ভূমিকার জন্য তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। ১৯১৪ সালে বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একটি উল্লেখযোগ্য অপারেশনের ফলে কলকাতার রোদা কোম্পানি মাউসার পিস্তল এবং গোলা বারুদ লুট করা হয়। দুকরিবালা দেবী অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে এই অস্ত্রগুলি ও যুদ্ধের সরঞ্জাম গুলি নিজের হেফাজতে নিয়েছিল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি তার নিজ বাসভবনে সংরক্ষণ করেছিলেন। তারই এক পরিচিতের বিশ্বাসঘাতকতায় এই গোপন খবর পুলিশের কাছে পৌঁছে যায়। যার ফলে ১৯১৭ সালের জানুয়ারি মাসে হঠাৎ করে একদিন পুলিশ দুকরিবালা দেবীর বাড়ি ঘিরে ফেলেন। তার পুরো বাড়ি তল্লাশি করে পাওয়া যায় সাতটা মশার পিস্তল ও গোলা বারুদ। ব্রিটিশ পুলিশ দুকরিবালা দেবীর উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে এবং জোরালো জেরা শুরু করতে থাকে। শতজেরাতেও মাসিমার মুখ থেকে বের করতে পারল না যে, কে দিয়েছে তাকে পিস্তল গুলি। গ্রামের মেয়ে ,গ্রামের বউ দুকরি বালা দেবী কোলের শিশুকে বাড়িতে রেখে চলে গেলেন পুলিশের সঙ্গে। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারের রায়ে দুকরিবালা দেবীর দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। বন্দী জীবনের অসহ্য পরিবেশের মধ্যে থেকেও তার সঙ্গে জড়িত বিপ্লবীদের নাম পুলিশ তার মুখ থেকে বের করতে পারেনি। এই ঘটনা ইতিহাস একটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত কারণ দুকরিবালা দেবী ভারতের প্রথম মহিলা যিনি অস্ত্র আইনের অধীনে বন্দী হয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অমোঘ চিহ্ন রেখে ১৯১৮ সালে ডিসেম্বরে তিনি মুক্তি পান। এইভাবেই তিনি নিজের জীবনে পন করে রেখেছিলেন দেশকে পরাধীনতার শৃংখল থেকে মুক্ত করার। শত বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়েও নিজের লক্ষ্য পূরণ করার

উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছেন । তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন অন্যতম মহীয়সী নারী যার অবদান ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

উপসংহার:

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা অংশ নিয়েছিলেন পুরুষের সহযোগী ভূমিকায়। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বাংলার নারীদের যে সক্রিয় অংশগ্রহণ তা কেবল সমাজের নিম্নবিত্ত পরিবার থেকেই উঠে আসেনি এই আন্দোলনের শামিল হয়েছিলেন উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলারা। এখান থেকেই সূচনা হয়েছিল ভারতীয় নারী সমাজে তাদের নিজস্ব প্রতিবাদ প্রতিরোধ ক্ষমতা। যার ধারার স্রোত বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থান ও ক্ষমতায়নের দিকে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে নারীরা শুধু কেবল পেছন থেকে সমর্থন করেননি বরং সরাসরি আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিজেদেরকে যুক্ত করেছিলেন। তারা গোপনে সভার আয়োজন, বিপ্লবী সাহিত্য প্রচার, অস্ত্র সংগ্রহ এবং গুপ্তচরবৃত্তি করতো। নারীরা তাদের সাহসিকতা এবং ত্যাগের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। নারীদের এই অংশগ্রহণ শুধু রাজনৈতিক নয় ,সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছিল। তারা নারী শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সামাজিক অধিকার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছিল। নিজেদেরকে শুধুমাত্র ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেনি। স্বাধীনতার জন্য তারা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করতে গিয়ে কেউবা হয়েছেন শহীদ আবার কারোর জীবন কেটেছে অন্ধকার কারাগারের মধ্যে। শিক্ষার্থীরা যখন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পাঠ অধ্যয়ন করবে তখন তারা উচ্চ স্থানীয় বীরপুরুষ বিপ্লবীদের পাশাপাশি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে নারী সংগঠনের যে বিশেষ অবদান ছিল সে সম্পর্কে জ্ঞান আরোহন করতে পারবে। এই জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে তাদের মধ্যে যুক্তিবাদ ও বৌদ্ধিক বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকার এই আদর্শে দীক্ষিত হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীদের এই আত্মত্যাগ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। কবি বিকাশ চক্রবর্তী, তাই যথার্থই লিখেছেন_

“ তিরঙ্গা পতাকা আকাশেতে ওড়ে

গর্বেতে ভরে বুক

শত শহীদের রক্তে রাঙানো

ভারতবাসীর সুখ”।

References

১। পাল, রূপময়. (১৯৮৬). সূর্য সেনের সোনালী স্বপ্ন, কলকাতা, দ্বীপায়ন পাবলিশার্স।

২। দস্তিদার, পূর্ণেন্দু. (২০০৮).বীরকন্যা প্রীতিলতা, ঢাকা, অনুপম প্রকাশনী।

৩। চ্যাটার্জি, মনিনী. (১৯৯৯).ডু অ্যান্ড ডাই: দ্য চিটাগাং আপরাইজিং ১৯৩০_ ৩৪. ইন্ডিয়া, পেঙ্গুইন বুক।

৪। দাশগুপ্ত, কমলা. (২০১৫). স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী, কলকাতা, রেডিক্যাল ইমপ্রেশন।

৫। রায়, প্রকাশ. (২০২১). বিস্তৃত বিপ্লবী, চেন্নাই, নোশনপ্রেস।

৬। মাইতি,শচীন্দ্র. (১৯৭৫). ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন মেদিনীপুর, কলকাতা, ফর্মা কে এল।

৭। চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ. (১৯৯৭). লোকাল পলিটিস এন্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম, দিল্লি, মনোহর পাবলিকেশন।

৮। সেনগুপ্ত, সুবোধ. (২০১৩). সংসদ বাঙালি চরিতাবিধান, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ।